পঠন পাঠনে প্রাইভেট টিউশন

সুনীল ঘোষ

আশির দশকের গোড়ায় এবং নববই দশকের গোড়ায় দু'দুটো শিক্ষা কমিশন এ রাজ্যের শিক্ষা - চিত্রটি খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত হয়েছিল। একটি ভবতোষ দত্ত কমিশন, অন্যটি অশোক মিত্র কমিশন। সেই সব কমিশনেররিপোর্টের ভিত্তিতে এ রাজ্যের শিক্ষা আইনের অনেক রদবদল ঘটেছে। শিক্ষকদের বেতনের হার পূর্বাপেক্ষা অনেকলোভনীয় হয়েছে এবং সুনিশ্চিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর ঝিবিদ্যালয়, দেশের পাঁচটি শ্রেষ্ঠ ঝিবিদ্যালয়ের অন্যতম বলে ঘোষিত হয়েছে এবং কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ও শিরোপা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে নেই। এ থেকে মনে হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্রটি এখন খুব হতাশাব্যঞ্জক নয়। তাহলে এমন কী ঘটল যাতে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ রাজ্যের শিক্ষকদের কিছু বাধ্যব াধকতার বিষয়ে একটি নতুন আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন!

প্রস্তাবিত আইনটি নিঃসন্দেহে শিক্ষকদের আচরণবিধি সংক্রান্ত, সম্ভবত প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার লক্ষ্যেই। অথচ ঝিবিদ্য ালয় আইনে প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ করাই আছে, এমনকি শাস্তির ব্যবস্থাও। হয়তো অর্থমন্ত্রী পুরানো আইনটি যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন এবং তাঁর বিবেচনায় সুফল পেতে গেলে আরও কড়া দাওয়াইয়ের প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন। বোঝা য াচ্ছে সরকার এবং শিক্ষানিয়ামকেরা এরাজ্যে প্রাইভেট কোচিংয়ের ফলে যে অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত পড়াশুনা হচ্ছে না তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। আমরা সাধারণ মানুষেরা চিন্তিত হচ্ছি এরাজ্যে সত্যিকারের শিক্ষ াসংস্কার কবে হবে এবং কবে ফিরে আসবে পশ্চিমবঙ্গের হৃত গৌরব। যেহেতুপ্রাইভেট টিউশন নিয়ে কথা উঠেছে, আমরা য ারা চাই এই রাজ্যের সর্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে পড়াশুনা করেই উপকৃত হোক সেই কারণে বিষয়টির সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা জেনে নিতে চাই পশ্চিমবঙ্গে পঠনপাঠনের ব্যাপারে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে তার জন্য একমাত্র শিক্ষকেরাই দায়ী না কি অন্য কোন কারণ রয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা জেনে নিতে চেষ্টা করব শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের বর্তমান অবস্থান, শিক্ষার সফলতার জন্য কোচিং নির্ভরতা এখন এত আকর্ষনীয় কেন, উচচবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পিতামাতার সন্তানেরা সমভাবে শিক্ষার অধিকার লাভ করছে কি না, প্রাইভেট কোচিং জোর কদমে চলছে বলে অনুমোদিত বিদ্য ালয়ের শিক্ষার মান নিম্নগামী কেন, শিক্ষার নিম্নমানের জন্য দায়ী কি শুধুই ফাঁকিবাজ শিক্ষক না এ রাজ্যের শিক্ষানীতি অথবা বর্তমান অবক্ষয় প্রাপ্ত সমাজ চেতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আলোচনার মাধ্যমেই জানা যাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন এত অধঃপতন। জানা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় শিক্ষার তীর্থস্থান ছিল তা আজ সারা ভারতবর্ষের ছ াত্রদের কাছে পরিত্যজ্য এবং এ রাজ্যের মেধাবী তথা স্বচ্ছল পরিবারের ছাত্ররা কেন এত ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেয়। এই অ ালোচনার মাধ্যমেই আমাদের জানতে হবে প্রাইভেট টিউশন বন্ধের প্রাটির সারবত্তা কতটুকু, এরাজ্যের শিক্ষানিয়ামকদের ভূমিকাই বা কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ। এতসব আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা হল এই কারণে যে এই রাজ্যের শিক্ষ াব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সর্বস্তরেই আলোচনা শু হোক এটাই আমরা চাই। এই ব্যপারে শিক্ষাপরিচালকদের যেমন দ ায়বদ্ধতা রয়েছে, তেমনি যে শিক্ষক টিউশনে আপাদমস্তকডুবিয়ে রেখেছেন তাঁরও দায়বদ্ধতার বিষয়টি গুত্ব পাক। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে ফসল ফলান কঠিন হয়ে পড়বে।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে এরাজ্যে প্রায় শতকরা পঁচাত্তর জন পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীই এক বা একাধিক গৃহশিক্ষকের সহ

ায়তা গ্রহণ করে থাকে এবং সেইসব শিক্ষকেরা উচচবেতনে কোন না কোন সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিগত বৎসরে মাধ্যমিক এবং উচচমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থান অধিকৃত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে জানা গেছে যে তাদের সকলেরই পাঁচ - ছয়জন করে প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এখন প্রাইভেট টিউশনের বাজার এতই রমরমা যে প্রাথমিক স্তরে স্কুলে এড্‌মিশন টেষ্ট দেওয়ার প্রয়োজনেও সংশ্লিষ্ট বিদ্যলয়ের শিক্ষককে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে অভিভাবকগণ সচেষ্ট থাকেন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট টিউশনের চাহিদা এখন খুবই বেশী এবং ব্যাপক। ধরা যাক এই বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পৌনে ছ'লাখের মত। কাজেই সংখ্যার হিসাবে প্রাইভেট শিক্ষকদের প্রয়োজন যে কত হতে পারে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বানিজ্যিক নিয়মে চাহিদা বেশী হলে কিংবা নামী স্কুলের শিক্ষক হলে দক্ষিণাও সে অনুপাতে বেড়ে যায়। সুতরাং এই লোভনীয় কাজে সরকারী বা বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ এই সুযোগ গ্রহণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হলেই হলই বা!

আসলে ব্যাপার হল 'ফল পাকলে গাছেরও খাব এবং গোড়াও খাব' নীতি নিয়ে চলার জন্যই যত গন্ডগোল। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষকরা সত্যিই ছিলেন 'গু'। গু শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল তা এখন আর নেই। শিক্ষক যে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন সেখানকার ছাত্রদের প্রতি তাঁর ন্যূনতম দায়বদ্ধতাও আর অবশিষ্ট নেই। স্কুল ছিল যে কোন বিদ্যার্থীর গৃহ। আর শিক্ষক ছিলেন ছাত্রের অন্যতম অভিভাবক। ছাত্রের জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধি করা, পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ছাত্রকে তৈরী করে দেওয়া, পরীক্ষায় ভাল ফল করে উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়া, পিতামাতার চেয়েও তাঁদের যেন দায়িত্ব বেশী ছিল। এই দায়িত্ববোধ টাকার অঙ্কে মাপা হত না। আজ সে সব কথা যেন নিছক গল্প কথা। কিন্তু কেন এমন হল। আজ কেন শিক্ষকদের চরিত্রে কালিমা পড়েছে 'ফাঁকিবাজ' বলে। আমি বলছি না সব শিক্ষকই ফাঁকিবাজ। কিন্তু এই সংক্রামক রোগের হাত থেকে দায়িত্বশীল শিক্ষকেরাও অসুস্থ হতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু কেন? এই কেন-এর উত্তর 'ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতির' মত কেবলমাত্র একটি কারণের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে, তা কিন্তু নয়। এই অবক্ষয়ের যুগে আর পাঁচটা উঁচুস্তরের পেশার মত শিক্ষকতাও একটি অবৈধ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এরজন্য বর্তমান সমাজব্যবস্থা, আর্থিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অনাচার এবং সর্বোপরি সামাজিক দায়বদ্ধতার দুঃখজনক পরিণতি, হয়তো বা অন্যান্য আরও অনেক অজানা কারণ দায়ী।

এখন নানা কারণেই যৌথ পরিবার প্রথা অচল হয়ে গেছে। এসেছে ছোট ছোট পৃথগন্ন পরিবার। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উপার্জন অথবা সাংসারিক নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে ঘরের ছোট্ট সোনামনির পড়াশুনার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন না। বর্তমান দ্রুতলয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সন্তানের শিক্ষার বোঝাটি এক বা একাধিকগৃহ শিক্ষকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। বিদ্যালয়ের হালচাল দেখে তারা বুঝে গেছেন যে কাজটি আগে বিদ্যালয়েই সম্পন্ন হত সেটা এখন গৃহেই সারতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যেন পরীক্ষায় বসার জন্যই সীমাবদ্ধ। সমস্যা দাঁড়াচ্ছে অভিভাবকদের আর্থিক অসামঞ্জস্যতায়। উচচ আয়ের অভিভাবকের অঢেল অর্থের বিনিময়ে এই সমস্যা যদিও বা কটিয়ে উঠতে পারেন, নিম্ন আয়ের অভিভাবকেরা তা যে পারেন না সহজেই অনুমেয়। উচচ আয়ের পিতা-মাতা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিক্ষার জন্য নামীদামী গৃহশিক্ষক রাখেন, প্রয়োজনে ভিন্নরাজ্যে কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু শতকরা আশিভাগ ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য হয়না। এদের মধ্যেও তো মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যারা সুযোগ পেলে একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে এই রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হত। তারা কি শিক্ষার মাঝপথে হারিয়ে গিয়ে তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে না! এইখানেই প্রশ্ন আসছে শিক্ষাক্ষেত্রে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না।

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় গুত্বপূর্ণ সমালোচনা ছাপা হয়। সম্প্রতি নোবেলজয়ী শিক্ষাবিদ অমর্ত্য সেন যৎসামান্য সমীক্ষা চালিয়েই বহু ত্রুটির কথাই উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার ৫৪ বৎসর অতিক্রান্ত। এখনও কেবলমাত্র সদিচ্ছার অভাবে সেইসব ত্রুটি বহুলাংশেই বিদ্যমান। পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি, এসবের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি আছে যা প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। সর্বোপরি রয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের ফায়দা তোলার খেলা, স্বজনপোষণ, যা অযোগ্য লোকের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার নামান্তর এবং অবশ্যই শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা।

সম্প্রতি দুটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং তা' এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমটি হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার চূড়ান্ত আদেশ এবং দ্বিতীয়টিহ'ল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের 'সম্ভাবনাময় বিশ্ববিদ্যালয়' তালিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান পেতে ব্যর্থ হওয়া। প্রথম সংবাদে প্রকাশ ১ এপ্রিল ২০০২ তারিখ থেকেই স্কুলশিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার আদেশ কঠোরভাবে বলবৎ হচ্ছে। এই আদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি মর্যাদাহানিকর আদেশও (কোন কোনশিক্ষকের মতে এ নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলাও চলছে) তা' হ'ল তিনমাস অন্তর সব শিক্ষককে লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানাতে হবে যে তাঁরা টিউশন করেন না। কোনও শিক্ষকের বিদ্ধে অভিযোগ থাকলে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে ওই শিক্ষকের বিদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই আদেশের অন্যথা হলে ওই স্কুলে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই আদেশ রূপায়নের প্রতি শিক্ষকগণ কতটা আন্তরিক হবেন এবং সরকারই বা কতটা কঠোরতার সঙ্গে আদেশ অমান্যকারী শিক্ষকদের মোকাবিলা করবেন তা' ভবিষ্যতই বলতে পারে।

এই প্রবন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ক্ষেত্রে বেশ কিছু ত্রুটি আছেযার জন্য এই সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মানের প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতেপারছে না। এক কথাও বলা হয়েছিল যে শিরোপা (পাঁচ তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা) জুটেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যেও। তা' দিয়েছিলেন ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাণ্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞগণ। কিন্তু তাঁরাও সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু খামতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ইউ. জি. সি. প্রথমে বাছাই করেছিল দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের বিচারে সেগুলি হল 'সম্ভাবনাময়' বিশ্ববিদ্যালয়। ওই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। তারা ইউ. জি. সি. -র কাছ থেকে অনুদান পাবে পাঁচ বছরে ৩০ কোটি টাকা । কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওই তালিকায় চিল না। এর পরে ইউ. জি. সি. দেশের ২২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবেদনের ভিত্তিতে আরও ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় বাছাই করে। সেই 'সম্ভাবনাময়' বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাতেও হতভাগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। উচ্চশিক্ষায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আধুনিক দুনিয়ায় প্রতিযোগিতার উপযোগী করে গড়ে তোলাই ইউ. জি. সি. -র লক্ষ্য। তাই মোটা টাকার সহায়তা দিয়ে পঠনপাঠনের মান বিশ্বমানের স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যেই তাঁরা টাকার থলে নিয়ে তৈরী। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করতে দু-দুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যর্থ হ'ল। এই ব্যর্থতার দায়ভার শুধু কি শিক্ষকদের স্কন্ধেই চাপিয়ে দেওয়া হবে, না অন্য কারণগুলোও খতিয়ে দেখা হবে, সেটাই বিবেচ্য। আমি আবারও বলছি স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন যে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে তা' থেকে মুক্ত হতেই হবে।

এই যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা তখন শুধু আইন করেই কি শিক্ষকদের 'কর্মসংস্কৃতি' ফিরিয়ে আনাযাবে; না, শিক্ষাক্ষেত্রে পঠনপাঠন সুনিশ্চিত করা যাবে? সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাভবনের চার দেওয়ালের মধ্যে পঠনপাঠন সুনিশ্চিত করাই যখন দলমত, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিদ্বান, মূর্খ নির্বিশেষে সকলেরইকাম্য তখন রাজ্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে। গঠন করতে হবে যোগ্য লোকের সংগঠন, যাঁরা নতুনভাবে নতুন শিক্ষাকাঠামো তৈরী করবেন এবং তা কাজে লাগাবেন নিঃস্বার্থভাবে। এখানে কোন আবেগ নয়, আপোষ নয় বা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে খুশি করা নয় সামনে থাকবে একটিই লক্ষ্য। তা হল আমাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য উচ্চমানের শিক্ষার প্রসার, যারা পরবর্ত্তী কালে গড়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটিআদর্শ ভাবমূর্ত্তি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com